কাজী নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমেদ : একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা

সুস্নাত দাশ

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মজফ্‌ফর আহমেদের মধ্যেকার সম্পর্ক শুধুমাত্র রাজনৈতিক ছিল না– ছিল অত্যন্ত ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বমূলক নিবিড় অন্তরঙ্গতায় পরিপূর্ণ। নজরুলের প্রতি দশ বছরের বড় কাকাবাবুর স্নেহ ছিল প্রবাদপ্রতিম। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের প্রথম পর্যায়ে বিদ্রোহী কবি যখন সক্রিয় ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে (১৯১৯-১৯২৯) সে সময় নানা ক্ষেত্রে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্‌ফর আহমদের ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন এবং কমবেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এক

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুল ইসলামের প্রথম সাক্ষাৎ হয় কলকাতায় ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে। ইতিপূর্বে করাচী সেনা শিবির থেকে প্রেরিত নজরুলের কবিতা বা গল্প মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের উদ্যোগেই কলকাতার সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হাবিলদার নজরুল ইসলাম সেই বার তাঁর রেজিমেন্ট থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। এরই মধ্যে একদিন তাঁকে পথ চিনিয়ে ৩২, কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির নতুন অফিসে নিয়ে এসেছিলেন নজরুলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। ''কাকাবাবু'' নামেই যিনি বাংলার কমিউনিস্ট মহলে সুপরিচিত। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি দিয়েছেন এইভাবে:

'হ্যাঁ কাজী নজরুল ইসলামকে সেদিন আমি প্রথম দেখলাম। সে তখন একুশ বছরের যৌবনদীপ্ত যুবক। সুগঠিত তার দেহ আর অপরিমেয় তার স্বাস্থ্য। কথায় কথায় তার প্রাণ খোলা হাসি। যে সব কথা আগে চিঠিপত্রের মারফৎ হয়েছে সেসব কথা আবারও হল। তাকে আমি কলকাতায় এসে থাকতে বললাম। সাহিত্য সমিতির ঘরগুলি তাকে দেখিয়ে দিলাম। বললাম, এখানেই তার থাকার জায়গা হবে।' (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃঃ ৪০-৪১)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯১৯ সালে তখন ৪৯নং বাঙালী রেজিমেন্ট ভেঙে যাবার মুখে। অতএব নজরুলের আসা একরকম নিশ্চিতই ছিল। কাকাবাবুও এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এটাই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় যে মানুষের চেনা ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক মজফ্‌ফর আহ্‌মদ কিন্তু নজরুলকে বুকে টেনে নিতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করেন নি। এমনকি তাঁর সঙ্গে 'তুমি' সম্বোধনের বিরল প্রায় সম্পর্কও (এটা অনেকেরই জানা যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া ছোট বড় সকলেরই আপনি সম্বোধন করতেন) স্থান করেছিলেন। মজফ্‌ফর সাহেবের দূরদৃষ্টি এখানেই যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ধূমকেতু বিদ্রোহী কবিকে সঠিকভাবেই চিনতে পেরেছিলেন।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৮৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্ট পুরোপুরি ভেঙে গেল। নজরুলও কলকাতায় চলে এলেন ওই মার্চ মাসেই। তিন-চারদিন শৈলজানন্দর বোর্ডিং হাউসে থাকার পর নজরুল কাকাবাবুর পূর্বকথা মতো এসে উঠলেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। অফিস লাগোয়া একটি ঘরে থাকতেন কাকাবাবু। তাঁর ঘরেই নজরুলের জন্য আরো একখানা তখৎতপোশ পড়ল। এই ভাবেই শুরু হল একত্রিশ বছরের মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে একুশ বছরের নবীন যুবক নজরুল ইসলামের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। অবশ্যই এই সম্পর্কের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল সাহিত্য - প্রেম। কিন্তু পরবর্তীকালে কাকাবাবু সাহিত্যের মায়াবী অঙ্গন ছেড়ে চলে গেলেন সংগঠিত শ্রমজীবী রাজনীতির কংক্রীট সড়কে, কাজী নজরুল ইসলাম কিন্তু রয়ে গেলেন তাঁর কাব্য - সাহিত্য ও সঙ্গীতের একান্ত জগতেই, যদিও দেশপ্রেমের প্রচন্ড আবেগ তাঁকে নানা সময় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মাঝে টেনে এনেছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই ১৯২৩ সালের পথে থেকেই মুজফ্‌ফর সাহেবের সঙ্গে নজরুলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শিথিল হয়ে আসছে। কিন্তু একই সঙ্গে দৃঢ় হতে থাকে উভয়ের মধ্যকার আত্মিক সম্পর্ক। কাকাবাবু যেমন নজরুলকে নিকটাত্মীয় অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করতেন তেমনি নজরুলও যতদূর, যেভাবেই থাকুন মনে মনে জানতেন যে এই বাঙলা দেশে তার চিরস্থায়ী নিশ্চিত আশ্রয় একটিই আছে তা হল কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

৩২, কলেজ স্ট্রীট ঠিকানাতে থাকার সময়েই ইসলামের নামে বর্দ্ধমান সাব রেজিস্ট্রারের চাকরির একটা ইন্টারভিউ এসেছিল। নজরুল চাকরিটা নিতে ইচ্ছুকও ছিলেন। কিন্তু আফজালুল হক সাহেল সহ কাকাবাবুর অনেকেই নজরুলকে ওই ইন্টারভিউ দিতে দেন নি তাঁর সাহিত্য প্রতিভার হানি হবে বলে। নজরুলের জীবনে এই ঘটনা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

যা হোক 'মোসলেম ভারত' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক আফজালুল হক্ সাহেবের সঙ্গে কাকাবাবুই নজরুলকে পরিরয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই পত্রিকাতেই নজরুলের একুশ বছর বয়সের তাজা রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর খ্যাতি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছিল। মোহিতলাল মজুমদার এই সময়েই নজরুলকে অভিনন্দিত করে তাঁর বিখ্যাত পত্রটি লেখেন। অবশ্য একই সঙ্গে নজরুলের সৃষ্টিশীলতার প্রথম পর্বে তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গী ও প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিলেন কাকাবাবু। বুঝতে অসুবিধা হয় না, নজরুল জীবনের এই পর্যায়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য যদিও কাকাবাবু কখনোই তাঁর স্মৃতিকথাতেও তা সাড়ম্বরে ঘোষণা করেন নি।

১৯২০ সালেই কাকাবাবু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে একটা কিছুর মধ্য নিজের জীবনকে তিনি বিলিয়ে দেবেন– হয় সাহিত্য, নয় রাজনীতি। কাকাবাবু রাজনীতিকেই বেছে নিয়েছিলেন (সমকালের কথা - মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃঃ ২৭) কাকাবাবু নজরুলের কাছেই জানতে চাইলেন যে সে রাজনীতিতে যোগ দেবে কিনা। জবাবে নজরুল বললেন, 'তাই যদি না দেব তবে ফৌজে গিয়েছিলাম কিসের জন্য। এ প্রসঙ্গে কাকাবাবু লিখছেন:

'নজবুল যে নিছক কবি নয়, সে যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিকও এই কথাটা নজরুলের নূতন পাওয়া সাহিত্যিক বন্ধুদের

অনেকেই বুঝতে চাইতেন না, আর এই বোঝার জন্য অনেক অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হয়েছে।' (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃঃ ৬৫)

নজরুল জীবনের ট্রাজেডী আলোচনা করলে আজ বোঝা যায় যে কাকাবাবু একটু কম করেই বলেছেন। নজরুলের স্বভাবগত উদ্দামতা, প্রাণোচ্ছলতা ও বাঁধনহারা জীবনযাত্রাকে উস্কে দিয়ে কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু হয়তো কবির ক্ষতিই করেছিলেন।

যা হোক রাজনৈতিক সংগ্রামে যুক্ত থাকার আকাক্ষাতেই মুজফ্ফর আহ্মদ ও নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় ও ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হল সান্ধ্য দৈনিক 'নবযূগ' (মে ১৯২০) যদিও কাগজে সম্পাদকদ্বয়ের নাম ছাপা হত না। এইসময়ই (১৯২০ সালে) নজরুল দৈনিক 'নবযুগ' এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে অনেক জ্বালাময়ী ও আবেগপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন যা পরবর্তী কালে 'যুগবাণী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নবযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে একমাত্র এই দৈনিকেই শ্রমিক 'নবযুগের' কৃষকের কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হতো। ব্রিটিশ বিরোধী রচনার জন্য 'নবযুগকে' কয়েক মাস পরেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সময়ে কাকাবাবু ও নজরুল কলকাতায় লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে 'নবযুগ' এর প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন (৪-৯ সেপ্টেম্বর ১৯২০)।

নবযুগ সাময়িক বন্ধ হবার পর (জানুয়ারী, ১৯২১) নানা স্থানে অস্থায়ী ভাবে বসবাস করে মুজফ্ফর আহ্মদ ও নজরুল ইসলাম পাকাপাকি ভাবে বাস করতে এলেন 'নবযুগ' অফিসের পাশেই ৮/এ টার্নার স্ট্রীট-এর পাকা একতলা বাড়ীতে। বাড়ীটির চারিপার্শ্বে ছিল দরিদ্র মুসলিম বস্তী। মানুষের জীবন সংগ্রাম, দারিদ্র্য, রুটি-রুজির লড়াই এই সময় থেকে নজরুলের কাব্য সাহিত্যে ফুটে উঠতে থাকে। আর তৎকালে রচিত নজরুলের শ্রেষ্ঠতম কবিতাগুলির অনেকটিরই প্রথম পাঠক ছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ। এই বস্তী বাড়িতে থাকাকালীনই নজরুলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের। ক্রমে তা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় যা অবশ্য স্বল্প স্থায়ী হয়েছিল। যা হোক ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে 'নবযুগ' প্রকাশ পুনরায় বন্ধ হয়ে গেলে সাময়িকভাবে কাকাবাবু ও নজরুলের জীবনে বিচ্ছেদ আসে। 'নবযুগ' বন্ধ হবার মাসখানেক পূর্বেই (ডিসেম্বর ১৯২০) নজরুল কাগজ ছেড়ে চলে যান দেওঘরে। কারণ নজরুলের উঠতি সাহিত্যিক বন্ধুরা তাঁকে বোঝায় যে দৈনিক কাগজের কাজ সাহিত্যচর্চার অনুকূল নয়, তাঁকে নির্জন সাহিত্যচর্চা করতে হবে। বিশেষ করে 'মোসলেম ভারত' সম্পাদক আফজালুলক হক সাহেবই নজরুলের দেওঘর যাত্রার প্রধান প্ররোচক ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নজরূল দেওঘরে বসে শুধু মাত্র তাঁর কাগজের জন্যই প্রচুর পরিমাণে লিখে যাবেন। বিনিময়ে নজরুলের দেওঘর বাসের সমস্ত খরচ বহন করবেন (মাসিক একশত টাকা) আফজালুল সাহেব। কিন্তু নজরুলের দেওঘর বাস বিশেষ ফলদায়ক কিছু হয়নি। ওখানে অবস্থানকালে খুব বেশি লেখাও যেমন তিনি লিখতে পারেন নি, তেমনি আফজালুল সাহেব প্রতিশ্রুতিমতো তাঁকে টাকাও পাঠাতে পারেন নি। ফলে নজরুলকে প্রচন্ড আর্থিক দুরবস্থায় পড়তে হয়। এই অবস্থায় পুনরায় ত্রাণকর্তার ভূমিকায় এসে দাঁড়ান মুজফুফর আহ্মদ।

১৯২১ সালে নজরুলকে কাকাবাবু কলকাতায় ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু কবি তখনও আফজলুল হকের হাত থেকে মুক্তি পান নি। নজরুল তার সঙ্গেই আরো কিছুদিন থাকেন এবং হাতবদল হওয়া প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের 'নবযুগ' পত্রিকায় পুনরায় লিখতে শুরু করেন। এই ঘটনায় কাকাবাবু যে নজরুলের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে কথা তিনি তার স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। তবে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ যদি সময়ে তাঁর অনুজপ্রতিম কবিবন্ধুকে নিজের কাছে রাখতে পারতেন, তবে হয়তো নজরুলের ভবিষ্যৎ জীবন এতটা বিশৃঙ্খল ও ভবঘুরে হতো না। অবশ্য তিনি সে চেষ্টা করতে ব্যর্থ হন। যা হোক ওরকম প্রতিক্রিয়াশীল মালিকানাধীন কাগজের সঙ্গে নজরুলের বিপ্লবী মানসিকতার যে মিল হবে না তা সহজেই অনুমেয়। কবি পুনরায় কাগজ ছেড়ে দিয়ে আবার পথভোলা পথিকের জীবনই বেছে নিলেন।

দুই

এবার ঠিকানা উত্তরপূর্ব ভারত – কুমিল্লা। সঙ্গী আলি আকবর খান নামক এক বন্ধু। কার্যতঃ অবশ্য তিনি বন্ধুর আচরণ তো করেনই নি, উপরন্তু তিনি নজরুলকে নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যে বন্ধু অগ্রজের কথা অগ্রাহ্য করে নজরুল চলে গিয়েছিলেন, সেই মুজফ্ফর সাহেবই মাত্র ত্রিশটা টাকা সম্বল করে বহু কষ্ট সহ্য করে কুমিল্লার দৌলতপুর থেকে প্রায় কোনক্রমে নজরুলকে উদ্ধার করে এনেছিলেন (৮ জুলাই, ১৯২১)। কুমিল্লায় থাকাকালীনই নজরুলের সঙ্গে অবশ্য পরিচয় ঘটে তাঁর ভাবী বধূ প্রমীলার। একটা কথা অবশ্য সত্য যে নজরুলের কুমিল্লা ভ্রমণ যত বিরক্তিকর বা মর্ম বিদারকই হোক না কেন, এই সময়ে তিনি কতকগুলি অসামান্য রচনাও সৃষ্টি করেছিলেন।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় ফিরে এসে পুনরায় নজরুল কাকাবাবুর সঙ্গে ৩/৪ সি তালতলা লেন বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে নজরুল ইসলামের একত্রে এই শেষ বসবাস। এখানে থাকাকালীন নজরুল তার বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা করেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে এক শেষ রাত্রে। ভোরবেলা উঠে প্রথম সে কবিতা পাঠ করে শোনান তাঁর অগ্রজ প্রতিম বন্ধু মুজফ্ফর আহ্মদকে। জানা যায় যে কবিতাটি ছাপা হবার পর রবীন্দ্রনাথকে পড়ে শোনানোর পর আবেগাপ্লুত হয়ে বিশ্বকবি নজরুলকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নজরুল ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়ি ও কাকাবাবুর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছেড়ে আবার চলে যান কুমিল্লা। এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব তারপর থেকে আর কখনোই একত্রে বসবাস করেন নি। ১৯২১ সালে দু'জনে মিলে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু অর্থাভাবে তা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন কুতুবুদ্দিন আহ্মেদ নামে একজন ব্যক্তি তাদের কাছে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কাকাবাবু এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। পরবর্তীকালে অবশ্য কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছিলেন যে এটি ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ভুল সিদ্ধান্ত। বস্তুত কাগজ প্রকাশ করা সম্ভবপর হলে হয়তো নজরুলকে তিনি আরও কিছুদিন ধরে রাখতে পারতেন। হয়ত নজরুলের বাউন্ডুলে এলোমেলো জীবনধারা সুশৃঙ্খল হত; হয়ত নজরুলের

শেষ জীবনের বিষাদ ট্রাজেডী বাঙালী জাতিকে দেখতে হত না। যৌবনের উদ্দামতা কেটে গেলে হয়ত বা কাকাবাবু নজরুলকে অগ্রজের মতনই সঠিক পথের ও সঠিক নিশানার সন্ধান দিতে পারতেন।

নজরুলের হঠাৎ কুমিল্লা চলে যাওয়ার ফলে নজরুলকে নিয়ে কাকাবাবুর পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে নজরুলের সঙ্গে পত্র মারফৎ তাঁর কিছু মনান্তর ঘটে। আসলে কাকাবাবু নজরুলকে প্রচন্ড স্নেহ করলেও তাঁর এই হুজুগে জীবনযাত্রা মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু বিদ্রোহী কবিকে রুখবে এমন সাধ্য কার। কুমিল্লায় মাস পাঁচেক ইন্দ্র কুমার সেনগুপ্তর বাড়িতে কাটিয়ে নজরুল কলকাতায় ফিরে এলেন মাসিক একশত টাকা বেতনে 'দৈনিক সেবক' -এ যোগ দিতে। এ চাকুরী জীবন নজরুলের পছন্দ ছিল না। সে নিজেই একটি কাগজ প্রকাশ করতে উদগ্রীব ছিল। অবশেষে সেই সুযোগ এসে গেল 'ধুমকেতু' পত্রিকার সম্পাদনার মাধ্যমে। একজন প্রথমে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মজফ্ফর সাহেবের কাছেই এসেছিলেন 'ধুমকেতু' প্রকাশনার প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু কাকাবাবু তাকে ফিরিয়ে দেওয়ায় তিনি তখন নজরুলকে রাজী করুণ। সুতরাং 'ধুমকেতু' প্রকাশনা নিয়ে নজরুল ও কাকাবাবুর মধ্যে কোন পারস্পরিক যোগাযোগই হয় নি। তবে 'ধুমকেতু'তে 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে মুজফ্ফর আহ্মদও দুই একবার লিখেছিলেন। যাইহোক ধুমকেতু পত্রিকা বাংলার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। ধুমকেতুর মারফৎ নজরুল প্রধানত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণদের কাছে বিপ্লবের বাণী পৌঁছে দিচ্ছিলেন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কাকাবাবু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : '১৯২৩ -২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে মাথা তুলল তাতে নজরুলের অবদান ছিল, একথা বললে বোধহয় অন্যায় করা হবে না।' (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা।। পৃঃ ২৯২)।

১৯২১ সালে নভেম্বর মাসে নজরুল এবং মুজফ্ফর আহ্মদ স্থির করেন যে তাঁরা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। ফৌজে থাকতে নজরুল রুশ বিপ্লবের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু 'ধুমকেতু' পর্যায়ে নজরুল সর্বহারা রাজনীতির সংগঠিত কর্মসূচী পরিত্যাগ করে অনেকটা যেন রোমান্টিক বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের আবেগসর্বস্ব স্রোতে ভেসে গেলেন। নজরুলের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা কামনায় ঘাটতি ছিল না ঠিকই কিন্তু এই সময় তাঁর পথ মার্কসবাদী শ্রেণী রাজনীতি ও বাংলাদেশে সেই আদর্শের অন্যতম প্রারম্ভিক প্রবক্তা মুজফ্ফর আহ্মদের পথ থেকে ভিন্ন হয়ে গেল।

১৯২২ সালের ২৩শে নভেম্বর কাজী নজরুল ইসলামকে পুলিশ কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করে ধুমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার অভিযোগে। নজরুল জেল থেকে ছাড়া পান ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর। নজরুলের সাজা হওয়ার (১৬ই জানুয়ারী ১৯২৪) কয়েক মাসের মধ্যে মুজফ্ফর আহ্মদও কানপুর কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হয়ে কারান্তরালে চলে যান। দু'জনের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শেষ যোগসূত্রও ছিন্ন হয়ে যায়।

তিন

১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবার স্বরাজ পার্টি কলকাতায় গঠিত হয়। এই দলের প্রথম ইস্তাহার রচনা করেন নজরুল। দীর্ঘদিন এই ইস্তাহার অপ্রকাশিত ছিল। যেমন এখনও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে নজরুল। যেমন এখনও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে নজরুলের ফৌজে থাকাকালীন রচিত বেশ কিছু কবিতা, ডায়েরী ও চিঠিপত্রের বাক্সটি কিভাবে কাকাবাবু হারিয়ে ফেরেছিলেন সেই বৃত্তান্ত। মুজফ্ফর তাঁর রাজনৈতিক স্মৃতিকথায় পরে তা লিখবেন বলে লিখে উঠতে পারে নি। জানিনা এ বিষয়ে সমকালীন যুগের কোনো ব্যক্তিত্ব কিছু আলোকপাত করতে পারেন কিনা।

যা হোক, 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র মুখপত্র রূপে ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকা। নজরুল ছিলেন তার প্রধান পরিচালক। প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় নজরুলের আর একটি কালজয়ী কবিতা 'সাম্যবাদী' যা রুশ সহ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'কৃষকের গান' এবং তৃতীয় সংখ্যায় 'সব্যসাচী' কবিতা। এই সময় নজরুল বাস করেছিলেন হুগলীতে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মুজফ্ফর আহ্মদের কোলকাতায় অনুপস্থিতি সত্ত্বেও 'শ্রমিক কৃষক' সর্বহারা রাজনীতির প্রতি নজরুলের আস্থা তখনও সুস্পষ্ট ছিল। কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনের প্রয়াস (১৯২৫) নিঃসন্দেহে একসময় নজরুলকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল।

কাকাবাবুর সঙ্গে নজরুলের পুনরায় দেখা হয় পাক্কা তিন বছর পরে কৃষ্ণনগরে ১৯২৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। নজরুল তখন স্বদেশী নেতা হেমন্তকুমার সরকারের আশ্রয়ে স্ত্রী ও শাশুড়ী সহ কৃষ্ণনগরে বসবাস করছেন।

১৯২৬ সালে নজরুল ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মী। কৃষ্ণনগরেই গঠিত হল 'বঙ্গীয় কৃষক - শ্রমিক দল'। নজরুল সম্মেলনে উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে গেয়েছিলেন স্বরচিত শ্রমিকের গান। তাছাড়া ১৯২৬ সালেই কাকাবাবু যখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ লাভ করেন, নজরুল তখনই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সদস্য। কৃষ্ণনগর ছিল সেইসময়ে (১৯২৬) রাজনীতির প্রাণক্ষেত্র। এবং নজরুল তাতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২৬ সালে মুজফ্ফর আহ্মদের অনুরোধে নজরুল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগীতের বাংলা তর্জমা (অন্তর ন্যাশনাল সংগীত) করেন। লেখেন 'কানজারী হুঁশিয়ার', 'ছাত্রদলের গান','চল চল চল'– এর মতো প্রেরণাদায়ক সংগীত। পরবর্তীকালে 'গণবাণী' পত্রিকা ছিল নজরুলের কাব্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম।

১৯২৬ সালেই নজরুলের আর একটি হঠকারী কাজ ছিল, হঠাৎই তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে বসলেন। অথচ তাঁর হাতে এই বাবদ একটি টাকাও ছিল না। কাকাবাবু বারংবার তাঁকে নিষেধ করেছিলেন নজরুলের মানসম্মানের প্রশ্ন তুলে। কিন্তু কবি তাতে কর্ণপাত করেন নি। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় সম্ভবত কিছু অর্থ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল যৎসামান্য। নির্বাচনে নজরুলের জামানত জব্দ হয়েছিল।

এইভাবে বারংবার দেখা গেছে নজরুল আকস্মিক আবেগাপ্লুত হয়ে নানা বিষয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে আঘাত পেয়েছেন। কাকাবাবু যতটা পেরেছেন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন বহুক্ষেত্রেই। নিজের মতামত ও সিদ্ধান্ত অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অভ্যাস ও মানসিকতা কাকাবাবুর চরিত্রে ছিল না বলেই নজরুল জীবনে অনেক অঘটনই ঘটেছিল।

কৃষ্ণনগরে নজরুল ছিলেন ১৯২৮ সালের শেষদিক পর্যন্ত। এরপর কলকাতায় এন্টালী এলাকায় ৮/১ পানবাগান লেনে। কাছেই ছিল ওয়ার্কস এন্ড পেজান্টস পার্টি অফিস (২/১ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন)। সুতরাং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুল পরিবারের যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চার

১৯২৯ সালের প্রথম থেকেই নজরুল জীবনের আর একটি পর্যায়ের সূত্রপাত যার সঙ্গে কাকাবাবুর কোনো সম্পর্কই ছিল না। রাজনীতির জগৎ ছেড়ে নজরুল ইসলাম পুরোপুরি অনুপ্রবিষ্ট হলেন সঙ্গীতের জগতে। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে পুনরায় চলে গেলেন কারান্তরালে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তখন এক নিবেদিত প্রাণ 'মার্কসবাদী' বিপ্লবী। যাহোক তখন থেকে প্রায় সাতটি বছর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের শেষ পর্যন্ত নজরুল ও কাকাবাবু পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন, যদিও কাকাবাবু চিকিৎসার জন্য জামিন পেয়ে খুব স্বল্প সময়ের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। নজরুল একসময়ে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সাহায্য করেছিলেন সঙ্গীত পরিবেশেন ও নানাভাবে বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দিয়ে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের সঙ্গে নজরুল শেষবারের মত একত্রে একটি রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন এই মামলায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পূর্বে ১৯২৯ সালের মার্চ মাসের প্রথমে কুষ্টিয়ায় একটি কৃষক সম্মেলনে।

নিঃসন্দেহে কবিরূপে যেমন, তেমনই সঙ্গীতকার রূপেও নজরুল ছিলেন একজন জনপ্রিয়তম সার্থক স্রষ্টা। কেউ কেউ এমনও মনে করেন, নজরুল চেতনার গভীরতা যথেষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় তার কিছু অসামান্য গানে। উনিশশো ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ যে সময়ে কমিউনিস্ট রাজবন্দী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেই সময়ে কাব্য সাহিত্য সংগীতে নজরুল প্রতিভা ছিল মধ্যগগনে। কিন্তু একই সঙ্গে প্রভূত অর্থ সমাগমের কারণে নজরুলের মধ্যে বেহিসেবী বিলাসিতার ঝোঁক দেখা যায়। চারিত্রিক উচ্ছলতা, উদ্দামতা, মজলিশী আড্ডার রাস টানার মতো উপকারী বন্ধুর সত্যিই তখন খুব অভাব ছিল নজরুলের মধ্যে। দু-চারজন ছাড়া সকলেই তাঁর চতুঃপার্শ্বে স্বার্থের প্রয়োজনে ঘোরাফেরা করতেন। একের পর এক তিনি তাঁর গ্রন্থস্বত্বগুলি বিক্রি করে দিচ্ছিলেন ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই। তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে নজরুল একহাতে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করেছেন, অন্যহাতে সেই অর্থ জলের মতো ব্যয় বা অপব্যায় করেছেন। যিনি নজরুলকে এইসময়ে কিছুটা শৃঙ্খলার বাস্তব জগতে ফেরাতে পারতেন, সেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তখন ছিলেন কারান্তরালে। ফলে ১৯৩৯ সালে যখন নজরুল জায়া প্রমীলা দেবী গুরতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁর চিকিৎসার খরচ জোটানোর জন্য হাত পাততে হলো সুদখোর মহাজনের কাছে।

এ প্রসঙ্গে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তার স্মৃতিকথায় লিখছেন:

''বুলবুলের মৃত্যুর কিছুকাল পরে নজরুল মোটরগাড়ী কিনেছিল তার 'অগ্নিবীণা'র স্বত্ব বিক্রয় করে। সে সময়ে মোটরগাড়ীর দাম সস্তা ছিল। পেট্রলের দামও ছিল সস্তা। ড্রাইভারের মাইনাও ছিল কম। এই সব কিছু বিবেচনা করলেও নজরুলের পক্ষে মোটর গাড়ী কেনা ছিল হঠকারিতা। পরে নজরুল আমার নিকটে এই কথা স্বীকার করেছে।''

(কাজী নজরুল প্রসঙ্গ - বিংশ শতাব্দী - ১৯৫৯, পৃঃ ১২৪)

যদিও জানা যায় নজরুলের মোটরগাড়ী কেনার বিষয়টি ছিল একান্তভাবেই তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান বুলবুলের অকালমৃত্যু থেকে উদ্ভুত ভাবাবেগ প্রসূত সিদ্ধান্ত (বুলবুল মোটরগাড়ী খুব ভালবাসত), তথাপি নজরুলের এই জাতীয় বিলাসিতা ছিল বাস্তব বিবর্জিত।

নজরুলের শেষজীবনে দুটো পয়সার জন্য গ্রামাফোন কোম্পানীতে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে শত শত গান লিখে ও সুর দিয়ে রেকর্ড করতে হয়েছিল। এই সময়ে নজরুল কি গান লেখেন নি। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলা যায়, ''শোনা যায় নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী। পৃথিবীতেই নাকি কোনো একজন কবি এতো বেশী গান রচনা করেন নি। কথাটা অসম্ভব নয় – শেষের দিকে নজরুল গ্রামাফোন কোম্পানীর ফরমাসে যান্ত্রিক নিপুণতায় অজস্র গান উৎপাদন করে যাচ্ছিলেন– প্রেমের গান, কালীর গান, ইসলামী গান, হাসির গান– সবরকম। সে সব গান বোধহয় গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয় নি, তাই তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা অনেকে জানি না।''

(নজরুল সমীক্ষণ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত। পৃ: ৮৩ - ঢাকা)

এর ফলে নজরুলের স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে। এরই মধ্যে তখন তিনি শুরু করেছেন আধ্যাত্মিক তুকতাক যোগ সাধনা, মন্ত্রতন্ত্রের অলৌকিক জগতে বিচরণ। এরপর ১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়লে অর্থাভাবে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নি। হলে নজরুল হয়তো বাকশক্তি রহিত ও স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়তেন না। আসলে ১৯৩৭ সালের পর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে আত্মগোপন করে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংগঠিত করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হচ্ছে। তিনি নজরুল সম্পর্কে খুব কমই সংবাদ পেতেন। কিছু খবর কানে আসলেও কাকাবাবুর সেক্ষেত্রে কিছুই প্রায় করার ছিল না। এ প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন:

''১৯৩৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বন্দীদশা হতে মুক্তি পেয়ে এসে আমি মাঝে মাঝে নজরুলদের বাড়ী গিয়েছি। কিন্তু ১৯৩৭ সালে আমি সারাক্ষণ পুলিশের চরদের দ্বারা অনুসৃত হতে থাকি। এই চরদের সঙ্গে নিয়ে কোনও বন্ধুর বাড়ি যাওয়া চলতো না। এই কারণে নজরুলদের বাড়ী যাতায়াত আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার মাঝে মাঝেও যাওয়া চলতো যদি সক্রিয় রাজনীতিতে এখনও নজরুলের যোগ

থাকতো। তা ছিল না।”

(কাজী নজরুল প্রসঙ্গ - বিংশ শতাব্দী ১৯৫৯, পৃঃ ১৬১)

উনিশশো তিরিশ দশকের শেষার্ধে অবশ্য নজরুল আধ্যাত্মিক ভাবে আচ্ছন্ন ও নতুন ইয়ার দোস্ত, সাহিত্যিক বন্ধু নিয়ে মশগুল হয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁর হয়তো মনেই পড়তো না যে একদা ১৯২১ সালে তারা দুই বন্ধু ভারতবর্ষে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

নজরুল অসুস্থ হবার পরে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে (৯ই জুলাই অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশনে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন) সর্বপ্রথম কাকাবাবু নজরুলের শাশুড়ী মাতা গিরিবালা দেবীর কাছে শুনলেন হাইকোর্টের সলিসিটর অসীম কৃষ্ণ দত্তের নিকট মাত্র চার হাজার বিনিময়ে নজরুলের গানের রয়ালটি ও পুস্তকাদি বাঁধা পড়ে আছে।

নজরুলের জীবনের শেষ অধ্যায়ে ট্রাজেডী আজও আমাদের অনুতাপ বাণে দগ্ধ করে। এতবড় একজন কবি প্রতিভা মাত্র ৪৩ বছর বয়সে শেষ হয়ে গেলেন। আরও কত কী নজরুলের দেওয়ার ছিল কে তার হিসাব করবে। আজ পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করলে বোঝা যায় এই রকম পরিণতির জন্য নজরুল নিজেও কম দায়ী ছিলেন না। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কথাগুলি অস্বীকার করা যায় না কোনমতেই।

‘নজরুলের রোগের প্রথম সূচনা কখন হয়েছিল তা বলা কঠিন। সে নিজে নিশ্চয় তার ভিতরে এই রোগের আবির্ভাবটা অনেক আগেই টের পেয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যদি কোন বিশিষ্ট চিকিৎসকের কাছে যেত তা হলে আজ আমাদের দেশ তাকে এইভাবে হারাত না। তাহলে আমাদের চোখের সামনে আজ এক জীবন্মৃত নজরুলকে দেখতে হত না। দেশের কত দুর্ভাগ্য যে নজরুলের যখন বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ছিল, তখন সে আশ্রয় নিয়েছিল আধ্যাত্মিকতার কোটরে। এই আধ্যাত্মিকতা যে কি তা আমি জানি না, তবে তা রোগের ঔষধ নয়।” (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা : পৃঃ ৪৪৭)

নজরুল ইসলামের মত প্রাণবন্ত সাহসী ও বিপ্লবী প্রাণপুরুষ কেন নিজেকে এইভাবে ক্ষয় হতে দিলেন সে প্রশ্ন অনেকেরই। মুজফ্‌ফর সাহেব এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

‘নজরুল ইসলাম মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সমাজের ইতিসাহ শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস মার্কসবাদের এই মোদ্দা কথাটি সে মানত। তার কবিতায় সাম্যবাদের সুর আছে। সাম্যবাদের দর্শনের নাম দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। একইসঙ্গে এই দর্শনের নাম দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। একইসঙ্গে এই দর্শনে বিশ্বাসী ও অধ্যাত্মবন্দী কেউ হতে পারল না, অথচ, নজরুল ইসলাম আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। যে ছাত্ররা নজরুল ইসলামের সাহিত্য নিয়ে চর্চ করেছেন তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে এটা কি করে সম্ভব হল? এর উত্তর আমি ওপরে দিয়েছি, অবশ্য তা আমারই উত্তর। অনেকেই অবশ্য আমার সঙ্গে একমত হবেন না জেনেও আমি বলব নজরুল যখন আধ্যাত্মিক সাধনা করতে গিয়েছিল তখন সে পরিপূর্ণরূপে সুস্থ ছিল না। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কোনো কোনো সূত্র সে মানত ঠিকই কিন্তু এই দর্শনটি সে যে কখনও আয়ত্ত করেনি একথাও ঠিক।”

(কাজী নজরুল প্রসঙ্গে। পৃঃ ১৬০। বিংশ শতাব্দী ১৯৫৯)

দেশবাসীর দুর্ভাগ্য যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যদি তার অনুজপ্রতিম প্রিয় বন্ধুর দুর্দিনের সংবাদ পূর্বেই কোনমতেই পেতেন তবে হয়তো নজরুলের মত অসামান্য প্রতিভাকে সুরক্ষিত করার প্রয়াসী হতে পারতেন, যেমনটি অতীতে অনেকবারই তিনি করেছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ কাকাবাবু পাননি। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখছেনঃ

‘‘নজরুল ইসলামের আধ্যাত্মিকতার পুরো যুগটি আমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। বিচ্ছিন্ন না থাকলেও তাকে হয়ত এই পথ হতে ফেরাতে পারতাম না, কিন্তু চেষ্টা তো করতে পারতাম।” (কাজী নজরুল প্রসঙ্গে। পৃঃ ১৬২। বিংশ শতাব্দী ১৯৫৯)

এই দুই অসামান্য ব্যক্তিত্বের নিবড়ি সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের পরিসমাপ্তি ঘটাবো কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিতে মুজফ্‌ফর সাহেবের পরিচয় তুলে ধরে।

১৯২৬ সালে এক ব্যক্তি ছদ্মনামে ‘আত্মশক্তি’ পত্রিকায় ‘গণবাণী’ পত্রিকাকে কটাক্ষ করে একটি পত্র লেখেন। নজরুল তৎক্ষণাৎ জবাব ‘আত্মশক্তি’তে একটি আবেগ মথিত সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। তার অংশবিশেষঃ

‘দয়া করে একবার ৩৭ হ্যারিসন রোজের ‘গণবাণী’ অফিসে পদধূলি দিয়ে যান।... দেখে চোখে জল আসে, বিশেষ করে যখন দেখি গণবাণীর কর্ণধার হতভাগ্য মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে। অবস্থা তা সব ফকিরের ফোকরা, হাঁড়িতে ভাত নেই সানকিতে ঠোকরা। আর শরীরের অবস্থাও তেমনি। যেন সমগ্র মানব সমাজের প্রতিবাদ। আমি হলপ করে বলতে পারি মুজফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক, চক্ষুতেও জল আসবে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌনী কর্মী, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা সবচেয়ে এমন উদার বিপুল বিরাট মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবীর দেশ নোয়াখালীতে? এই মোল্লা মৌলবীর দেশ বাঙলায়, ভেবে পাইনে ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না।”

(ডঃ আব্দুল হালিম; নবজীবনের পথে; ন্যাশানাল বুক এজেন্সী, ১৯৬৬)

কাজী নজরুল ইসলাম ও কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের চলার পথ শেষ পর্যন্ত দু-দিকে বেঁকে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪২ এর পর নজরুলের কণ্ঠ যখন চিররুদ্ধ হয়ে গেল তারপর বহুদিন পর্যন্ত মুজফ্‌ফর সাহেল তাঁর নীরব হয়ে যাওয়া বন্ধুর পাশে বসতেন। ১১ই জৈষ্ঠ, নজরুলের জন্মদিনে মাথায় বুলাতেন স্নেহময় হাত, দুচোখে ঝরতো জলের ধারা। একটি রাজনৈতিক সম্পর্ক তখন অন্য এক মানবিক রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। কলের কপোলতলে সমুজ্জ্বল দুই মহাজীবনের সম্পর্কের বহুমাত্রিক এই চরিত্র, এখনও গবেষণার বিষয়।